

আল্লাহা ইঈউসুফ লুথিয়ানবি শহিদ বহ.

কাদিয়ানি এবং অন্যান্য কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য

আলী হাজান ডেসায়া
অনুবৃত্ত

আনুগত্য

আলী হাজান ডেসায়া

কা দিয়ানি এ বং অন্যান্য কা ফি র দে র ম ধ্যে পা র্থ ক্য



আল্লামা ইউসুফ লুথিয়ানবি শহিদ রহ.

কা দিয়া নি এ বং অন্যান্য কা ফি র দে র ম ধ্যে পা র্থ ক্য

আলী হাসান উসামা

অনূদিত

উৎসর্গ

যারা নিজেদের বুকের তাজা খুন দিয়ে যুগে যুগে সমুন্নত রেখেছে খতমে নবুওয়াতের পতাকা। মুসায়লামা কাযযাব থেকে শুরু করে দাজ্জাল অবধি সকল ভণ্ডকে রুখে দেওয়ার জন্য যারা কাঁধে তুলে নিয়েছে জিহাদের মহান ব্রত। আল্লাহ তাদের সবাইকে মিলিত করুন মহান জান্নাতুল ফিরদাউসে।

প্রারম্ভিক

ইসলামের আলোকে কাদিয়ানিরা আদি কাফির (কাফিরে আসলি) নাকি মুরতাদ বা জিন্দিক?

আলিমগণ জানেন, ইসলামের এই পরিভাষাত্রয় ভিন্ন ভিন্ন মর্মের জন্য ব্যবহার করা হয়। আর এগুলোর বিধানও ভিন্ন ভিন্ন।

কাদিয়ানিরা কখনোই আদি কাফির নয়। কারণ, তারা পূর্ব থেকেই নিজেদেরকে মুসলমান বলত। আবার মুরতাদও নয়। মুরতাদ এ জন্য নয় যে, তারা কুফরিতে লিপ্ত থাকার পরও নিজেদেরকে কাফির বলত না। বরং ভ্রান্ত চিন্তাধারা লালন করা সত্ত্বেও নিজেদেরকে মুসলমান প্রমাণ করতে অনমনীয় ও একগুঁয়ে ছিল। বিধায় তাদের ওপর কেবল জিন্দিকের সংজ্ঞাই প্রযোজ্য হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, শরিয়তে জিন্দিকের হুকুম কী? সমস্ত আহলের ইলমের নিকট জিন্দিকের হুকুম হলো, গ্রেফতার হওয়ার আগে তাওবা করলে তার তাওবা গৃহীত হবে। গ্রেফতার হওয়ার পর তাওবা করলে তা আর গৃহীত হবে না। গ্রেফতার করার পর তাকে হত্যা করা হবে।

কিন্তু আমাদের দেশে কাদিয়ানিদেরকে কাফির ঘোষণা করে তাদেরকে জিন্মিদের মান দেওয়া হয়েছে। তাদের জান-মালের জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ শরিয়াহর হুকুম ছিল, প্রথমে তাদের আকিদা থেকে তাওবা করার নির্দেশ দেওয়া।

তাওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গেলে তো ঠিক আছে। অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা। তাদেরকে কাদিয়ানি হিসেবে বাকি রাখা এবং রাষ্ট্রীয় ও আইনি নিরাপত্তা প্রদান করার অর্থ তাদের ইলহাদের ওপর রাজি থাকা এবং দলীয়ভাবে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ করা। অথচ এ বিষয়ের ওপর উম্মাহর ইজমা রয়েছে যে, হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে যারা বেয়াদবি করবে, তারা ওয়াজিবুল কতল। তাদেরকে হত্যা করা অপরিহার্য। ইসলামি রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়াও যদি কোনো ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করে, তবে এর জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হবে না।^১

এবার একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন, যাদের ব্যাপারে শরিয়াহর এই নির্দেশ ছিল যে, তাদের প্রাণ ও সম্পদ মুসলমানদের জন্য মুবাহ (বৈধ)। কোনো মুসলমান রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়াও যদি তাদেরকে হত্যা করে, তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে, এ কারণে সে শরিয়াহর দৃষ্টিতে অপরাধী হবে না। এখন এই শ্রেণির মানুষের প্রাণ ও সম্পদকে সম্মানিত ঘোষণা করে রাষ্ট্রের ওপর তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অথচ এখনো তারা পূর্ববৎ জিন্দিক ও মুলহিদই রয়েছে। তাদের উপাসনালয় পূর্বের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের ধর্মপ্রচার আগের তুলনায় আরও প্রকাশ্যে হচ্ছে।

এবার আপনারাই ভাবুন, কাদিয়ানিদের জন্য মন্দ হয়েছে নাকি ভালো হয়েছে? আপনারা এমন একটা দলকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যারা কোনো অবস্থায়ই দেশে থাকার অনুমতি পেতে পারে না। এরা আদি কাফির থেকেও নিকৃষ্ট। কারণ, আদি কাফিররা জিম্মি হয়ে মুসলিম দেশে থাকতে পারে। কিন্তু জিন্দিক ও মুরতাদরা তা থাকতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এরা শুধু দেশে আছে তা-ই নয়; বরং এরা অন্য সবার মতো রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে।

যদি এ কথা বলা হয় যে, কাদিয়ানিরা আগে মুরতাদ ছিল আর এখন তাদের সন্তানেরা আদি কাফিরের হুকুমে। তাদের এই ধারণাও ভুল। কাদিয়ানিরা না আগে মুরতাদ ছিল, না এখন আদি কাফির। শরিয়তের দৃষ্টিতে তারা আগেও জিন্দিক ছিল, এখনো জিন্দিক রয়েছে।

^১ পড়ুন—আসসারিমুল মাসলুল, ইমাম ইবনু তাইমিয়া; ফিতনার বজ্রধ্বনি, আলী হাসান উসামা

স্মরণ করা যেতে পারে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রেমে পাগলপারা মুজাহিদরা যখন লাহোরে কাদিয়ানিদের কেন্দ্রে আক্রমণ করে, তখন কতিপয় মানুষ এ কথা বলে আক্রমণের নিন্দা জানিয়েছিল যে, কাদিয়ানিদেরকে যেহেতু কাফির ঘোষণা করা হয়েছে, সুতরাং তারা এখন জিম্মি। এমনকি কতিপয় ইলমের বোঝা বহনকারী এ কথা পর্যন্ত বলেন যে, কিয়ামতের দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ কাদিয়ানিদের সঙ্গে দাঁড়াবেন, তাদের সাথে থাকবেন। অথচ আহলে ইলমগণ জানেন যে, কাদিয়ানিরা জিন্দিক। আর জিন্দিকরা কখনো জিম্মি হতে পারে না। সুতরাং যেই ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে এত বড় অপবাদ আরোপ করেছে যে, খাতামুন নাবিয়্যিন ﷺ কিয়ামতের দিন এসব মালাউন ও অভিশপ্তদের সঙ্গে থাকবেন, যারা কিনা খতমে নবুওয়াতের আকিদাকে রক্তাক্ত করেছে, যারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা প্রদর্শন করেছে। যারা এমন মারাত্মক কথা বলেছেন, তাদের তাওবা করা উচিত। অন্যথায় কাদিয়ানিদের প্রতি সম্প্রীতি লালন করার অপরাধে তাদের সঙ্গেই এসকল লোকের হাশর হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

মাওলানা আবদুল্লাহ আসিম উমর হাফি.
আমিরুল কিতাল ফি শিবহিল কাররাতিল হিন্দিয়াহ

কাদিয়ানি এবং অন্যান্য কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য কী?

আমাদের অনেক ভাই ও বোনের মাথায় এই প্রশ্ন আসে যে, কাদিয়ানি এবং অন্যান্য কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য কী? কাদিয়ানিদের মধ্যে এমন কী বিশেষত্ব আছে, যার কারণে অন্য সকল কাফির দলের চাইতে তাদের বিষয়টা অধিক মন্দ ও ভয়াবহ? যেখানে অন্যান্য কাফিরদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক মেলামেশা, প্রয়োজনীয় সম্পর্ক রাখা ও আর্থিক লেনদেন করা বৈধ, সেখানে কাদিয়ানিদের সঙ্গে এসবের কোনো কিছুই অনুমতি নেই। পৃথিবীতে কাদিয়ানিরা ছাড়াও আরও অনেক কাফির সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। যেমন : ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু ও শিখ প্রভৃতি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিশেষভাবে এই কাদিয়ানিদের মোকাবিলা করার জন্য সারা বিশ্বে অনেক স্বতন্ত্র খতমে নবুওয়াত সংরক্ষণ পরিষদ এবং এ ধরনের আরও বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্লোবাল খতমে নবুওয়াত সংরক্ষণ পরিষদ নিজেদের ওপর এই দায়িত্ব অপরিহার্য করে নিয়েছে, যেখানে যেখানে কাদিয়ানিরা পৌঁছে গেছে, আল্লাহ তাআলার দীনের সাহায্য করার জন্য এবং মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করার জন্য তারাও ঠিক সেখানে সেখানে পৌঁছে যাবে। এরপর তারা মুসলিম জনসাধারণের সামনে কাদিয়ানিদের মুখোশ উন্মোচন করবে। অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের মোকাবিলা করার জন্য এরকম কোনো বৈশ্বিক সংগঠন নেই।

ইমামুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. এবং পির মেহের আলি শাহ রহ. থেকে শুরু করে আমিরে শরিয়ত সায়্যিদ আতাউল্লাহ শাহ বোখারি রহ. পর্যন্ত এবং

শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি রহ. থেকে শুরু করে হজরত মাওলানা খাজা খান মুহাম্মাদ রহ. পর্যন্ত সব বিদ্বৎ আলিমরা এই কাদিয়ানি ফিতনা দমনের ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তাদের জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ এই ফিতনা দমনের পেছনে ব্যয় করেছেন। জনসমক্ষে খুলে খুলে তাদের দাবিদাওয়ার অসারতা বয়ান করেছেন। এসবেরই বা কী কারণ! এককথায়, কাদিয়ানি এবং অন্যান্য কাফিরদের মধ্যে আদতে পার্থক্য কী?

অবশ্যই কাদিয়ানি এবং অন্যান্য কাফিরদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণেই অন্যান্য কাফিরদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক মেলামেশা করা ও প্রয়োজনীয় সম্পর্ক রাখার অনুমতি থাকলেও কাদিয়ানিদের ক্ষেত্রে এগুলো কোনো কিছুই বৈধ নয়। কাদিয়ানিরা মুরতাদ ও জিন্দিক। মুরতাদ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করে নেয়। আর জিন্দিক হলো ওই ব্যক্তি, যে নিজের কুফরি আকিদা-বিশ্বাসকে ইসলামের নামে চালায়। সুতরাং এজাতীয় ব্যক্তির হালা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। পৃথিবীতে কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা কোনো ধরনের গুরুত্ব ও শিথিলতা প্রাপ্তির উপযুক্ততা রাখে না। উপরন্তু যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, পৃথিবীর আইনে তারাও থেফতার হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। কাদিয়ানিরাও যেহেতু জিন্দিক ও মুরতাদ, সুতরাং ইসলামি শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে তারা কোনো ধরনের গুরুত্ব বা শিথিলতা প্রাপ্তির উপযুক্ততা রাখে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইহুদি-খ্রিষ্টানের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন, তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তিও করেছেন; কিন্তু নবুওয়াতের দাবিদার (মুসায়লামা কাযাবাব ও আসওয়াদ আনসি)-এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখাকে শুধু নাজাযিয বলেই আখ্যায়িত করেননি; বরং সাহাবি ফায়রুজ দায়লামি রা.-এর দ্বারা আসওয়াদ আনসিকে হত্যা করিয়েছেন এবং মুসায়লামা কাযাবাবকে আবু বকর সিদ্দিক রা. জাহান্নামে পৌঁছিয়েছেন।

অন্যান্য কাফিররা নিজেদের কুফর স্বীকার করে এবং নিজেদেরকে অমুসলিম বলে পরিচয় দেয়, নিজেদেরকে মুসলমানদের থেকে আলাদা জাতি হিসেবে ঘোষণা করে। অপরদিকে কাদিয়ানিরা নিজেদের আকিদার ব্যাপারে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদেরকে ধোঁকায় ফেলে এবং নিজেদেরকেও মুসলমান হিসেবে উপস্থাপন করে।

এই মাসআলা তো সবার জানা আছে যে, শরিয়তে মদপান নিষিদ্ধ। মদ পান করা, মদ তৈরি করা, মদ বিক্রি করা—এ সবই হারাম কাজ। এটাও জানা আছে যে, শূকর হারাম এবং সত্তাগতভাবে নাপাকা শূকরের গোশত বিক্রয় করা, শূকরের লেনদেন করা, শূকরের কোনো অংশ খাওয়া বা পান করা অকাট্যভাবে হারাম। এখন এক ব্যক্তি মদ বিক্রয় করছে, নিশ্চয়ই সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে আরেক ব্যক্তি মদ শুধু বিক্রয়ই করছে না; বরং মদের গায়ে জমজমের লেবেল লাগিয়ে তা বাজারজাত করছে, মানুষকে জমজমের নামে মদ খাওয়াচ্ছে। অপরাধী তো উক্ত দুজনই। কিন্তু এই দুই অপরাধীর মধ্যে পার্থক্য কী? এটা নিশ্চয়ই আপনাদের খুব ভালো করে জানা আছে।

বাজারে একজন ব্যক্তি শূকরের গোশতকে শূকরের গোশত বলেই বিক্রি করছে। সবাই ক্রয় করার আগেই স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে, এটা কিন্তু শূকরের গোশত। যার ইচ্ছা কিনে নাও। আর যার ইচ্ছা নিয়ো না। নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি শূকরের গোশত বিক্রয় করার অপরাধে অপরাধী। অপরদিকে আরেকজন ব্যক্তি শূকর ও কুকুরের গোশত বিক্রি করছে ছাগলের গোশত বলে। অপরাধী তো দুজনই। কিন্তু উভয়ের অপরাধের মাত্রায় আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে। একজন হারাম জিনিস বিক্রি করছে হারাম নামেই, যেই নাম শুনলেও মুসলমানদের ঘৃণা আসে। অপরজন হারাম জিনিস বিক্রি করছে হালাল নামে, যে নাম শুনে সবাই ধোঁকা খেয়ে যায়, ছাগলের গোশত ভেবে বাসায় কিনে নিয়ে গিয়ে হালাল মনে করেই খায়। শূকরের গোশতকে শূকরের গোশত বলে বিক্রয় করা আর একই গোশতকে ছাগল বা দুগ্ধার গোশত বলে চালানোর মধ্যে যে পার্থক্য, ইহুদি খ্রিষ্টান হিন্দু শিখ প্রভৃতি গোষ্ঠী এবং কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের মধ্যেও একই পার্থক্য।

কুফর সর্বাবস্থায়ই কুফর। ইসলামের বিপরীত বিষয়। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য কাফিররা নিজেদের কুফরের ওপর ইসলামের লেবেল লাগায় না এবং মানুষের সামনে নিজেদের কুফরকে ইসলামের নামে উপস্থাপন করে না। কিন্তু কাদিয়ানিরা নিজেদের কুফরের ওপর ইসলামের লেবেল লাগায় এবং মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বলে বেড়ায়, কাদিয়ানি ধর্মমতই হলো প্রকৃত ইসলাম।

কাফিরদের প্রকার

এখন বিষয়টা তাত্ত্বিকভাবে বুঝে নিই। কাফিরদের অনেক প্রকার আছে। কিন্তু কাফিরদের তিনটি প্রকার হলো বিলকুল সুস্পষ্ট।

ক) সাধারণ কাফির :

কাফির বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে অস্বীকার করে অথবা খোলামতো কুফরে লিপ্ত হয়। এ ধরনের কাফির ব্যক্তিকে সাধারণ কাফির বলা হয়। এর মধ্যে ইহুদি খ্রিষ্টান হিন্দু প্রভৃতি সবাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মক্কার মুশরিকরাও এ প্রকারের কাফির ছিল।

খ) মুনাফিক :

দ্বিতীয় প্রকারের কাফিরদেরকে মুনাফিক বলা হয়। এরা মৌখিকভাবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে; কিন্তু ভেতরে কুফর লালন করে। এদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ২৮ নম্বর পারার সূরা মুনাফিকুনের প্রথম আয়াতে বলেন—

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

যখন আপনার কাছে মুনাফিকরা আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন, বাস্তবেই আপনি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।

মুনাফিকদের কুফর সাধারণ কাফিরদের চেয়ে গুরুতর ও জঘন্য। কারণ, তারা একইসঙ্গে কুফর ও মিথ্যার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছে। তারা মুখে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে সুপ্ত কুফর লালন করা ও মিথ্যা বলার পাপে লিপ্ত হয়েছে।

গ) জিন্দিক :

মুনাফিকদের চেয়েও আরও বড় অপরাধী হলো জিন্দিক। একে তো তারা কাফির; উপরন্তু তারা নিজেদের কুফরকে ইসলাম নামে আখ্যায়িত করে। নিখাদ কুফরকে তারা ইসলামের নামে বাজারজাত করার অপচেষ্টা করে। এমনকি তারা কুরআন মাজিদের আয়াত, প্রিয়নবি ﷺ-এর পবিত্র হাদিস এবং সাহাবি ও বুজুর্গদের বাণীর অপব্যাখ্যা করে তার আলোকে নিজেদের কুফরকে ইসলাম হিসেবে সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস চালায়। এ ধরনের লোকদেরকে শরিয়াহর পরিভাষায় ‘জিন্দিক’ বলা হয়।

মুরতাদের বিধান

চার মাজহাবের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হবে, ইসলাম ত্যাগ করবে, তাকে তিন দিনের অবকাশ দেওয়া হবে। এই তিন দিনের মধ্যে তার সংশয় দূর করার চেষ্টা চালানো হবে। তাকে ভালোভাবে বোঝানো হবে। যদি তার বুঝে চলে আসে এবং সে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে, তাহলে তো ভালো। অন্যথায় আল্লাহর জমিনকে তার অস্তিত্ব থেকে পবিত্র করা হবে। এই মাসআলাকে ‘মুরতাদ হত্যা’র মাসআলা বলা হয়। এই মাসআলার ব্যাপারে আমাদের ইমামগণের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই।

সকল ধর্ম, দেশ, সরকার এবং সভ্য আইনে বিদ্রোহীর শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। ইসলামের বিদ্রোহী সেই ব্যক্তি, যে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়, মুসলমান থেকে মুরতাদ হয়। এ কারণে ইসলামে মুরতাদের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু এক্ষেত্রেও ইসলাম লক্ষ রেখেছে, তাকে যেন তিন দিনের অবকাশ দেওয়া হয়। এই তিনের মধ্যে সে যদি ইসলাম বুঝে ফেলে এবং তাওবা করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তাকে আর শাস্তির সম্মুখীন করা হবে না। পৃথিবীতে অন্যরা বিদ্রোহীকে এ ধরনের সুযোগও দেয় না। তার ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতার প্রতিই লক্ষ রাখে না। অত্যন্ত পরিতাপের কথা হলো, এর পরও মুরতাদের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশিত শাস্তির ব্যাপারে আপত্তি করা হয়।

অ্যামেরিকান গভর্নমেন্টের প্রতি বিদ্রোহকারী কোনো ব্যক্তি যদি তাদের গদি উলটে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং এই প্ল্যান বাস্তবায়ন করার আগেই সে গ্রেফতার হয়, তাহলে

তার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা হয়। এ ব্যাপারে কেউ কোনো আপত্তি উত্থাপন করে না। কিন্তু বিশ্বাসের ব্যাপার হলো, মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের ব্যাপারে যদি মৃত্যুদণ্ড জারি করা হয়, তাহলে মানুষ মন্তব্য করা শুরু করে, এই শাস্তি হওয়া উচিত নয়।

কারও হাতে পচন ধরলে ডাক্তার তার হাত কেটে ফেলে। কারও আঙুলে পচন ধরলে ডাক্তার সেই আঙুল হাত থেকে আলাদা করে ফেলে। সমগ্র পৃথিবী জানে, এটা কোনো অবিচার নয়। এটা কোনো জুলুম নয়। বরং এটা হচ্ছে স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, অনুগ্রহ ও মায়া। কারণ, সময়মতো যদি পচে যাওয়া অঙ্গ না কাটে, তাহলে এর বিষাক্ত প্রভাব সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়বে। পচনের ক্রিয়া থেকে বাঁচার জন্য পচে যাওয়া অঙ্গ কেটে ফেলতে হয় এবং এটাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। রিদ্বাহ (ধর্মত্যাগ)-ও ইসলামের গায়ে এক ধরনের পচন। মুরতাদকে তাওবার ‘তালকিন’ করার পরও সে যখন পুনরায় ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা পছন্দ করে না, তখন তার অস্তিত্ব বিনাশ করে দেওয়া অপরিহার্য। অন্যথায় তার বিষ ধাপে ধাপে পুরো মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ছড়িয়ে যাবে।

মোদাকথা, চার ইমামের নিকট এবং পুরো মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম ও ফকিহের নিকট মুরতাদের বিধান একমাত্র মৃত্যুদণ্ড। বিবেক ও বুদ্ধির দাবিও তা-ই। আর এতেই রয়েছে উম্মাহর নিরাপত্তা।

জিন্দিকের বিধান

জিন্দিক—যে নিজের কুফরকে ইসলাম হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য প্রচেষ্টারত—তার বিষয় মুরতাদের চেয়েও সঙ্গিন ও ভয়াবহ। ইমাম শাফেয়ি রহ. ও প্রসিদ্ধ মত অনুসারে ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, জিন্দিকের বিধান মুরতাদের বিধানের অনুরূপ। অর্থাৎ তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে। যদি সে তিন দিনের মধ্যে তাওবা করে, তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর যদি সে তাওবা না করে, তাহলে সে ওয়াজিবুল কতল সাব্যস্ত হবে। সুতরাং এই দুই ইমামের দৃষ্টিতে মুরতাদ ও জিন্দিকের বিধান অভিন্ন। অপরদিকে ইমাম মালিক রহ. বলেন :

لَا أَقْبِلُ تَوْبَةَ الزَّانِدِيقِ.

আমি জিন্দিকের তাওবা কবুল করব না।

অর্থাৎ তার ওপর অপরিহার্যভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। সুতরাং কারও ব্যাপারে যদি জানা যায়, সে জিন্দিক। সে নিজের কুফরকে ইসলামের নামে চালানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। আর এই অপরাধে ওই ব্যক্তি গ্রেফতার হয়। এরপর সে নিজের ভুল স্বীকার করে বলে, আমি তাওবা করছি। আগামীতে আর কখনো এরূপ করব না। তাহলে এই ব্যক্তির তাওবা কবুল করা আল্লাহর কাজ। আমরা অপরিহার্যভাবে তার ওপর আইনের শাস্তি জারি করব। পৃথিবীর পৃষ্ঠে তার অস্তিত্ব বাকি রাখব না। যেমনিভাবে ব্যাভিচার ও ধর্ষণের শাস্তির ক্ষেত্রে তাওবার দ্বারা ক্ষমা হয় না। সর্বাবস্থায় তার ওপর শাস্তি প্রযোজ্য

হয়। ব্যক্তি তাওবা করুক বা না করুক, কোনো অবস্থায়ই পার্থিব শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পায় না। কোনো ব্যক্তি যদি চুরি করে ধরা খায়, তবে সে শত তাওবা করলেও অপরিহার্যভাবে তার হাত কাটা হবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর মত হলো, জিন্দিক ওয়াজিবুল কতল। তাকে হত্যা করা অপরিহার্য। থেফতার করার পর তার তাওবা গ্রহণ করা হবে না। হ্যাঁ, কোনো জিন্দিক যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজের থেকে এসে তাওবা করে, অন্য কেউ আদৌ জানতই না যে, সে একজন জিন্দিক, সে নিজেই তার জিন্দিক হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে এবং আন্তরিকভাবে তাওবা করে, তাহলে এই ব্যক্তির তাওবা গৃহীত হবে। অনুরূপভাবে কারও ব্যাপারে যদি এটা জানা থাকে যে, সে জিন্দিক; কিন্তু থেফতার হওয়ার আগেই আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করেন, সে নিজেই আত্মসমর্পণ করে অনুতপ্ত হয় এবং তাওবা করে জিন্দিক থেকে পুনরায় মুমিন হয়ে যায়, তবে তার তাওবাও গৃহীত হবে। তার ওপর মুরতাদের দণ্ড প্রয়োগ করা হবে না। তবে থেফতার হওয়ার পর কেউ যদি শতবারও তাওবা করে, তার তাওবা আর গৃহীত হবে না।

এ বিষয়টি ভালো করে বোঝা উচিত, কাদিয়ানি হচ্ছে জিন্দিক। কারণ, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে কাফির। অকাট্যভাবে কাফির। যেমনিভাবে কালিমা তায়িবা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’-এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা আমাদের কালিমা এবং যে এই কালিমার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে সে কাফির; একইভাবে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ও তার অনুসারীরা কাফির হওয়ার ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই। যে তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে, সে-ও মুসলমান থাকবে না।

কাদিয়ানিরা কাফির হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের কুফরকে ইসলামের নামে উপস্থাপন করে। তারা নিজেদের পরিচয় দেয় এই বলে, আমরা ‘আহমদিয়া মুসলিম জামাআত’। তাদের দাবি অনুসারে তারা মুসলমান। লন্ডনে তাদের বসতির নাম পর্যন্ত রেখেছে ইসলামাবাদ। তারা বলে বেড়ায়, আমরা তো ইসলাম প্রচার করি। যখন কোনো মুসলমানের সঙ্গে তাদের কথা হয়, তখন তারা এই বলে ধোঁকা দেয়, দেখো, মোল্লারা কীভাবে মানুষের মধ্যে ভুল প্রচার করে এবং আমাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়ায়। এই দেখো, আমরা

নামাজ পড়ি। রোজা রাখি। এই করি, সেই করি। এমনকি আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সর্বশেষ নবি হিসেবেও বিশ্বাস করি। আমাদের বাইয়াতের শর্তের মধ্যেই লেখা রয়েছে, আমরা অন্তরের সত্যবাদের সঙ্গে মুহাম্মাদ ﷺ-কে ‘খাতামুন নাবিয়্যিন’ তথা সর্বশেষ নবি হিসেবে মানি।

এ কারণেই কাদিয়ানিরা (যাদেরকে মির্জায়িও বলা হয়) জিন্দিক। কারণ, তারা নিজেদের কুফরের ওপর ইসলামের প্রলেপ লাগায়। তারা মদ এবং প্রস্রাবের ওপর জমজমের লেবেল লাগায়। তারা কুকুরের গোশতকে হালাল পশুর গোশত বলে চালিয়ে দেয়। সমগ্র পৃথিবী জানে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সর্বশেষ নবি। এটা মুসলমানদের এমন একটা আকিদা, যে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ও সংশয় রাখার অবকাশ নেই। বিদায় হজের ভাষণে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে মানুষসকল, আমি সর্বশেষ নবি এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মত।’

দুই শ’র চাইতে অধিক হাদিস এমন, যাতে বিভিন্ন শিরোনামে, বিভিন্ন পন্থায়, বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপস্থাপনায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খতমে নবুওয়াতের মাসআলা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পর আর কোনো নবি নেই। তার পর আর কাউকে নবুওয়াত প্রদান করা হবে না।

‘আখেরি নবি’ বা ‘খাতামুন নাবিয়্যিন’ অর্থ হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পর আর কারও মাথায় নবুওয়াতের মুকুট রাখা হবে না। এখন কোনো ব্যক্তিই নবুওয়াতের মসনদে পা রাখবে না। যারা পূর্বে নবি ছিলেন, তাদের সকলের ওপর তো আমাদের আগে থেকেই ইমান আছে। মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো ব্যক্তি নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত হবে না। সুতরাং উম্মাহর জন্যও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পরে আর কারও ওপর ইমান আনার প্রয়োজন পড়বে না। মোদ্দাকথা, ‘খাতামুন নাবিয়্যিন’ অর্থ হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের দ্বারা নবি আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। নবুওয়াতের ধারার ওপর মোহর লেগে গেছে। খামের ওপর সিল মেরে দেওয়া হয়েছে। এখন আর কোনো প্রকারের নবির আগমন ঘটবে না। যারা আগে থেকে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাদের কাউকেও আর বের করা যাবে না।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি মুসলমানদের এই শাস্ত আকিদার অপব্যাখ্যা করে। সে বলে, ‘খাতামুন নাবিয়্যিন’ অর্থ এটা নয় যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ নবি কিংবা তাঁর পর নবুওয়াতের দরজা বন্ধ। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আগামীতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মোহর থেকে নবি বানানো হবে। পূর্বে নবুওয়াত আল্লাহ তাআলা নিজে প্রদান করতেন। কিন্তু এখন এই দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সোপর্দ করেছেন। এখন নবি ﷺ চাইলে যে-কারও ওপর মোহর লাগাতে পারেন এবং তাকে নবি বানাতে পারেন।

এটাই হচ্ছে ইলহাদ ও জানদাকা। তারা নাম ব্যবহার করে ইসলামের; কিন্তু তারা নিজেদের কুফরি আকিদার ওপর কুরআনের আয়াতের অপব্যবহার করে। এছাড়াও নিজেদের অসংখ্য কুফরি আকিদাকে ইসলামের নামে উপস্থাপন করে। মির্জা বশির আহমদ লিখেছে :

‘যে ব্যক্তি মুসাকে মানে, কিন্তু ইসাকে মানে না অথবা ইসাকে মানে, কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ-কে মানে না, উপরন্তু প্রতিশ্রুত মাহদি (মির্জা কাদিয়ানি)-কে মানে না, সে শুধু কাফিরই নয়; বরং পাক্কা কাফির এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে খারেজ।’^২

কাদিয়ানিরা দাবি করে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুইবার পৃথিবীতে আগমন নির্ধারিত ছিল। প্রথমবার তিনি মক্কা মুকাররামায় এসেছেন। তার এই আগমন ১৩০০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে তিনি মির্জা কাদিয়ানির রূপে কাদিয়ান নামক গ্রামে দ্বিতীয়বার প্রেরিত হয়েছেন। এ জন্য তাদের দৃষ্টিতে গোলাম আহমদ কাদিয়ানি স্বয়ং মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ ﷺ। কালিমা তায়্যিবায উল্লেখিত ‘মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’ দ্বারা উদ্দেশ্য মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি। মির্জা বশির আহমদ লিখেছে :

‘প্রতিশ্রুত মাহদি (মির্জা কাদিয়ানি) স্বয়ং মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ ﷺ; যিনি ইসলাম প্রচারের জন্য দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় আগমন করেছেন। এ জন্য আমাদের নতুন কোনো কালিমার দরকার নেই। হ্যাঁ, মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্থলে যদি অন্য কেউ আসত, তাহলে এর প্রয়োজন দেখা দিত।’^৩

^২ কালিমা তুল ফাসল, পৃ. ১১০

^৩ কালিমা তুল ফাসল, পৃ. ১৫৮

সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’ অর্থ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মির্জা রাসুলুল্লাহ’, যিনি দ্বিতীয়বার কাদিয়ান নামক গ্রামে আবির্ভূত হয়েছেন।

তারা আলাদা নবি বানিয়েছে। স্বতন্ত্র ধর্মীয় গ্রন্থ গ্রহণ করেছে, যার নাম *তযকির*। কাদিয়ানিদের দৃষ্টিতে এই *তযকির*র মর্যাদা তাওরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনের অনুরূপ। কাদিয়ানিরা আলাদা উন্মাহও গঠন করেছে। তারা স্বতন্ত্র শরিয়াহ বানিয়েছে। কালিমা ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছে। তারা নিজেদের ধর্মের নামও ইসলাম রেখেছে এবং আমাদের ধর্মের নাম রেখেছে কুফর।^৪

^৪ উক্ত বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য লেখক এখানে আরও কিছু ব্যাখ্যামূলক আলোচনার অবতারণা করেছেন। যেহেতু তাতে নতুন কোনো বিষয় উঠে আসেনি, তাই সংক্ষেপনের স্বার্থে আমরা আর তার অনুবাদ যোগ করিনি।

মুরতাদ এবং তার বংশধরের বিধান

মূলনীতি হলো, মুরতাদকে তিন দিনের অবকাশ দেওয়ার পর হত্যা করা হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, মুরতাদরা একটা দলে পরিণত হলো। ইসলামি সরকার তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো না। এ কারণে তাদের ওপর মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করা সম্ভাবিত হয়নি। এভাবে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এই মুরতাদরা মৃত্যু বরণ করল; কিন্তু তাদের বংশধররা রয়ে গেল। উদাহরণস্বরূপ, কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা সকলে পারস্পরিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে খ্রিষ্টান হয়ে গেল। কিন্তু কেউ তাদেরকে হত্যা করল না, তারা গ্রেফতারও হলো না। এভাবে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তারা সকলে মরে গেল। তাদের বংশধর যারা ছিল, তারা মুসলমান থেকে খ্রিষ্টান হয়েনি; বরং তারা ছিল বাপ-দাদা থেকে চলে আসা বংশানুক্রমিকভাবে খ্রিষ্টান। মুরতাদদের সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে ইসলামের বিধান হলো, তাদেরকে বন্দি ও প্রহার করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে; কিন্তু তাদেরকে হত্যা করা হবে না। কারণ, মুরতাদের সন্তান মুরতাদ হিসেবে গণ্য হয় না; বরং তারা সাধারণ কাফির হিসেবে বিবেচিত হয়।

জিন্দিক কাদিয়ানি এবং তার বংশধরের বিধান

কাদিয়ানিদের ব্যাপারটি সাধারণ মুরতাদদের চাইতে ভিন্ন। তাদের বংশধারা যদি এক শ পুরুষ পর্যন্তও চলে যায়, এরপরও তাদের ওপর জিন্দিক ও মুরতাদের বিধানই প্রযোজ্য হবে; সাধারণ কাফিরদের বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে না। কারণ, তাদের অপরাধ হলো ইলহাদ ও জানদাকা। অর্থাৎ কুফরকে ইসলাম এবং ইসলামকে কুফর বলে আখ্যায়িত করা। এই অপরাধ শত পুরুষ অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রতি প্রজন্মের মধ্যেই জারি থাকে। সুতরাং সকল কাদিয়ানির বিধান অভিন্ন। চাই তারা ইসলাম ত্যাগ করে কাদিয়ানি ধর্মমত গ্রহণ করার দ্বারা মুরতাদ ও জিন্দিক হোক কিংবা তাদের দাবি অনুসারে জন্মগতভাবে আহমদি হোক। কাদিয়ানি বাবা-মা'র ঘরে জন্মগ্রহণ করার দ্বারা উত্তরাধিকারসূত্রে এই ধর্মমতের অধিকারী হলেও তারা মুরতাদ ও জিন্দিক বলেই আখ্যায়িত হবে। কারণ, তাদের অপরাধ শুধু এটা নয় যে, তারা ইসলাম ত্যাগ করে কাফির হয়েছে; বরং তাদের অপরাধ হলো, তারা ইসলামকে কুফর নামে আখ্যায়িত করেছে এবং নিজেদের কুফরি ধর্মকে ইসলাম বলে অভিহিত করেছে। এই অপরাধ প্রত্যেক কাদিয়ানির মধ্যেই পাওয়া যায়। চাই সে ইসলাম ত্যাগ করে কাদিয়ানি হোক কিংবা জন্মগতভাবে কাদিয়ানি হোক। এ মাসআলাটি খুব ভালোভাবে বুঝে নিন। অনেক মানুষ কাদিয়ানিদের হাকিকত সম্বন্ধে জানে না।

মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধের দাবি হলো, দুনিয়াতে একজন কাদিয়ানিও প্রাণে বাঁচবে না। প্রত্যেককে ধরে ধরে জাহান্নামে পাঠাবে। জযবার ভিত্তিতে আমি এই কথা

اے مسلمان! جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے
تو گنبد خضریٰ میں دل مصطفیٰ ﷺ دُکھتا ہے